বুলেটিন নং ঃ চার
প্রকাশকাল ঃ ২০ ফেব্রুয়ারী '৯৭
শুভেচ্ছা মুল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

স্বাধিকার

পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

অবিলম্বে জনগণের নায্য দাবী মেনে নিন

॥ রাজনৈতিক ভাষ্যকার ॥

পরবর্তী বৈঠকের স্থান নির্ধারণ ছাড়াই ২৭ জানুয়ারী সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার চলমান আলোচনা ঢাকায় দ্বিতীয় দফার মতো শেষ হয়েছে। ২১ ও ২৪ ডিসেম্বর দু'পর্বে প্রথম দফা বৈঠকটি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগামী বৈঠকটি হবে ১২ মার্চ।

অনেকটা তড়িঘড়ি ও নাটকীয়ভাবে বৈঠকের স্থান খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকায় বৈঠক হওয়াকে "আরো এক ধাপ অগ্রগতি" হিসেবে সরকারী ভাষ্যের মতো অভিজ্ঞমহলের অনেকেও একইভাবে ধরে নিয়েছিলেন।

২৫-২৬-২৭ জানুয়ারী তিনদিনব্যাপী ঢাকায় বৈঠক চলাকালে আনুষ্ঠানিক আলাপের পরেও, আরো কথাবার্তা চালিয়ে নেয়ার সুবিধার্থে সরকারী পক্ষের প্রতিনিধিরা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় রাত্রি যাপন করেন বলে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার সূত্রে জানা যায়।

বৈঠকে নেতৃত্বদানকারী সরকারী পক্ষের নেতা আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ২৪ ডিসেম্বরের বৈঠকে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে "ইনশাল্লাহ" বলে পরবর্তী বৈঠক অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে "চূড়ান্ত রূপরেখা" দেবার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

ঢাকায় বৈঠকচলাকালে সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ব ঘোষিত সমাধানের "চূড়ান্ত রূপরেখাটি" আদৌ উত্থাপিত হয়েছে কিনা তা আর জানা যায়নি। আনুষ্ঠানিক আলোপের বাইরে আরো কোন কোন বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে সে সবও জনগণের অজানা।

আসল কথা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের নীতিগত অবস্থান এখনো পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে পরিস্কার নয়। বিগত দু'দু'টি সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও সেই কথিত রাজনৈতিক সমাধানের সংজ্ঞা- ব্যাখ্যা আওয়ামী লীগ থেকে দেয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই কথিত "রাজনৈতিক সমাধানটি" যেমন অস্পষ্ট, তেমনি আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ প্রতিশ্রুত "চূড়ান্ত রূপরেখাটি" ও রহস্যাবৃত।

এই অতি আবশ্যক বিষয়গুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে অহেতুক আবেগ-উচ্ছাসে আপ্লুত হয়ে সীমান্তবর্তী পাড়া ধুধুক ছড়াতে "মিলন মেলা", "মানুষের ভিড়", "উৎসবের ঢল নামা" ... দেখতে পাওয়াটা কেবল কল্পনাবিলাসীদের পক্ষেই সম্ভব।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, নিছক বৈঠকের জন্য বৈঠক করা আর যুদ্ধ বিরতি বাড়ানোর মধ্যে আদতে নুতন কোন তাৎপর্য নেই। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, সমাধান না হয়েও বৈঠক হয়েছে। যুদ্ধ বিরতিও বেড়েছে।

কাজেই বৈঠক নিয়ে কল্পনাপ্রবণ হবার আগে যে কাজটি সবচেয়ে বেশী জরুরী তা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সরকারের "নীতিগত অবস্থান" সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া। আর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারেরও উচিত তার নীতিগত অবস্থানটি পরিস্কার করা। না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাদের সদইচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে সংশয় থেকে যেতে বাধ্য।

এখানে প্রাসঙ্গিক কারণেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আওয়ামী লীগের শাসনামলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সূত্রাপাত হয়েছিলো। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে দাবী-দাওয়া পেশ করতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় শেখ সাহেব দাবীনামাটি পড়ে দেখেননি। এমনকি প্রতিনিধিদলকে বসতেও বলা হয়নি। শেখ সাহেবের অফিসে সাক্ষাতের স্থায়িত্ব ৩/৪ মিনিটের অধিক হয়নি। দাবীনামাটি সাথে সাথেই শেখ সাহেব প্রত্যাখান করেন। উপেন্দ্র লাল চাক্মার বর্ণনামতে শেখ সাহেব দাবী নামাটি মানবেন্দ্র লারমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। (সূত্র Life is not ours, may 1991, পৃষ্ঠা ১৪)

শেখ সাহেব বেশ শাসিয়ে বলেছিলেন "লারমা তুমি কি মনে কর। তোমরা আছ ৫/৬লাখ। বেশী বাড়াবাড়ি করো না। চুপচাপ থাক। বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মারবো না (হাতের তাড় মেরে তান বলতে লাগলেন) প্রয়োজনে ১,২,৩,৪,৫- দশ লাখ বাঙালী অনুপ্রবেশ করে তোমাদেরকে উৎখাত

২য় পাতায় দেখুন

অন দ্যা রেকর্ড

○ ***"Bangladesh, which earned independence through a bloody struggle, can never support the suppression of people seeking independence"***

-Khaleda Zia, Leader of the Opposition and BNP Chairperson, [The Daily Star, February 03, 1997]

[এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত জনগণের ওপর দমন পীড়নকে কখনো সমর্থন করতে পারে না।

খালেদা জিয়া, বি.এন.পি চেয়ারপার্সন ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী।

ডেইলী স্টার, ০৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭]

○ *"পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা দাঙ্গা দমন করতে গিয়েছিলেন তাদের কয়েক জনকেও বীর উত্তম খেতাব দেওয়া হয়েছে।"*

- কাদের সিদ্দিকী [ভোরের কাগজ, ০২ জানুয়ারী ১৯৯৭]

○ *"বাংলাদেশের সামরিক জেনারেলরা লাল কার্পেট, গোলাপ ফুল ওয়ালা স্যুট এবং পাঁচ তারা হোটেল সোনারগাঁওয়ের সমুচা, কাটলেট বেশী পছন্দ করেন। তারা কতোটা যুদ্ধ করেছেন সেটা সবারই জানা আছে।.... আমাদের সেনা প্রধানরা কতো সমস্যা যে পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন তার প্রমাণ হলো আজো পার্বত্য সমস্যার সমাধান হয়নি।"*

[বি.এন.পি সাংসদ মেজর আখতারুজ্জামান। দৈনিক ভোরের কাগজ, ২১ জানুয়ারী, ১৯৯৭]

প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা কেমন আছেন?

-ইলিরা দেওয়ান

১৯৮৬ সালে সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারী বাঙালীদের অব্যাহত সন্ত্রাস, নির্যাতন, নিপীড়ন, হামলা, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া, লুটপাট ও দাঙ্গার ফলে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চাশ হাজারের অধিক জুম্ম বাস্তভিটা ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। গেলো ৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ও শরণার্থীদের মধ্যে ১৬ দফা চুক্তির ভিত্তিতে দু'দফায় মোট ১০২৭ পরিবার শরণার্থী স্বদেশে ফিরে আসে। সরকার ও শরণার্থীদের ১৬ দফা চুক্তির মধ্যে প্রতি পরিবারকে নগদ ১০,০০০ টাকা, দুই বান্ডিল ঢেউটিন এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবত ৫,০৯০ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। যদিও সরকার শেষোক্ত ৫,০০০ টাকা কখনো দেয়নি। চুক্তিতে সরকার কর্তৃক প্রতি পরিবারকে সপ্তাহে ২১ কেজি করে চাউল দেওয়ারও কথা ছিল। "প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ১৬ দফা বাস্তবায়ন কমিটি" জনপ্রতি সপ্তাহে পাঁচ কেজি করে চাউল দেওয়ার দাবী জানায়। সরকার মৌখিক ভাবে এ দাবি মেনে নিলেও তা কখনো বাস্তবায়ন করেনি। পরবর্তীতে সরকার অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য আড়াই কেজি এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য পাঁচ কেজি করে চাউল বরাদ্দ করে। অথচ আন্তর্জাতিক বিধিমালা অনুসারে অনুর্ধ্ব আট বছরের শিশুরা অর্ধেক রেশন পায়। কিন্তু সরকার আন্তর্জাতিক বিধিমালা লংঘন করে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাছাড়া শিশুদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই, নেই তাদের জন্য কোন পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা, নেই চিকিৎসা ব্যবস্থা। ফলে অনেক শিশু পুষ্টিহীনতায়, বিনা চিকিৎসায় অকালে মারা পড়ছে।

১৬ দফা চুক্তির মধ্যে সরকারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল প্রত্যাগত শরণার্থীদের জায়গা জমি ফেরত দেয়া হবে। শরণার্থীরা ফিরে এসে দেখল তাদের অনেকের জায়গা জমিতে আর্মি ক্যাম্প, চেক পোষ্ট অথবা অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা দখল করে আছে। ফলে শরণার্থীদের অনেকেই নিজের বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে পারেন নি। প্রশাসনের কাছে বার বার ধর্ণা দিলেও কোন ফল হয়নি। খাগড়াছড়ি সদর থানায় কুকিছড়া আর্মি ক্যাম্পটি যে জায়গায় অবস্থিত সেই জমির মলিক প্রত্যাগত শরণার্থী কালাধন চাক্মা। তার বাস্তুভিটা ফেরত পাবার জন্য দলিল পত্র সহ জেলা প্রশাসক, থানা নির্বাহী

২য় পাতায় দেখুন

উদ্ধৃতি

○ *এ দেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে, ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে।*

-বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

○ *যে তরুণেরা নির্বিচারে অতীতের বোঝা বহন করে, নিতান্ত গতানুগতিক পথে চলে, গড্ডল প্রবাহে গা ভাসায়, জানতে বুঝতে তর্ক করতে এবং অন্তরের ভুল বিশ্বাস ত্যাগ করে নতুন উন্নত বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, প্রয়োজনের সময়ে বিপদের ঝুঁকি গ্রহণে পিছ্ পা হয়, শোনা কথায় নির্বিচারে বিশ্বাস করে, ভণ্ড প্রতারক, ক্ষমতাবান প্রতিপত্তিশালী কায়েমী স্বার্থবাদী সৃষ্টি বিমুখ সৃষ্টিসম্ভাবনা সংহারক প্রবীণদের চক্রান্তে পড়ে শোষিত হয়, কিংবা তাদের থেকে অনুচিত সুবিধা নিয়ে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কলুষিত করে, স্বাভাবিকভাবেই মহৎ ও বৃহৎ কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।*

-আবুল কাশেম ফজলুল হক, সৃজন প্রয়াসী তরুণদের উদ্দেশ্যে, লোকায়ত, এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যা।

○ *'ঐক্য' সম্বন্ধে চীৎকার শুনেই কারুর বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। যাদের মুখে এই শব্দটা সবচাইতে বেশী ফোটে, তারাই বিভেদের বীজ বপন করে.....। .....সব চাইতে বড়ো সংকীর্ণতাবাদীরা সবচাইতে বেশী চেঁচামেচি করে।*

-ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

অবিলম্বে জনগণের নায্য দাবী মেনে নিন

করবো, ধ্বংস করবো।" (সূত্র ঃ ১০ই নবেম্বর '৮৩ স্মরণে, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-১৮-১৯)

এরপর ১৯৭৩ সালে রাঙামাটি সফরে গিয়ে বিশাল জনসভায় শেখ সাহেব আবারো কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। "উপজাতীয়" পরিচয় ভুলে গিয়ে বাঙালী হবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমস্যার জন্য আওয়ামী লীগ অতীতের ভুলের দায় এড়াতে পারে না। আর অতীত ভুলের উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলকর কিছু প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে না। অতীত ভুলের দায় স্বীকার, নীতিগতভাবে ভুল শুধরানোর সৎ সাহস প্রদর্শন ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়েই সমাধানের সঠিক পথে এগুনো সম্ভব হতে পারে।

'৭৫ এর পরবর্তী সরকার সমূহকে স্বাধীনতা বিপক্ষের শক্তি ও জনস্বার্থের বিরোধী বলে আওয়ামী লীগ থেকে বিবেচনা করা হতো। যে কারণে "৭ই নভেম্বরের"সরকারী ছুটিও আওয়ামী লীগ আমলে সরকারীভাবে পালন করা হয়নি। '৭৫ সালে প্রণীত কুখ্যাত ইনডেমনিটি বিলও বাতিল করা হয়েছে। এসব হচ্ছে নীতিগত বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুটিও যদি আওয়ামী লীগ সরকার নীতিগত বিষয় হিসেবে নিতে পারে, তাহলে এ যাবৎকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের যতো হত্যাকান্ড হয়েছে তার জন্য নৈতিকভাবে দায় স্বীকার করে পাহাড়ী জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হিরোশিমা-নাগাসাগিতে এটম বোমা দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর অপরাধের নৈতিক দায় স্বীকার করে এখনো জাপানে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে জাপানী জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানী সৈন্যদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার জন্য এখনো জাপানের সম্রাটকে কোরিয়া, চীন ও ফিলিপাইনে সফরে যেতে হলে সেখানকার জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য সরকারীভাবে ক্ষমা না চাইলেও, বাংলাদেশ সফরে আসলে পাকিস্তানের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানকে সাভারে স্বাধীনতাযুদ্ধের শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।

নৈতিকভাবে কোন অপরাধের দায় স্বীকার করে ক্ষমা না চাইলে, সে অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটার আশংকা দূর হয় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবৎ ডজনের অধিক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। এখনো অবস্থার খুব বেশী উন্নতি হয়নি। শান্তিপূর্ণ পন্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে বর্তমান আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে, আগেই বলা হয়েছে এই বৈঠক ও আর পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন কোন কিছু নয়।

যদি বৈঠকের আগে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার '৭২ সালে যে ভুল করেছিলো তার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে পাহাড়ী জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতো। বাঙালী জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেবার নীতি পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করতো। এ যাবৎকালে সংঘটিত সকল হত্যাযজ্ঞের নৈতিক দায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইতো। আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে বসার পারম্ভে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময় নারকীয় হত্যাযজ্ঞে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করতো। ধুধুকছড়ায় air lift দিতে যাবার সময় যদি স্মরণাতীত কালে সংঘটিত লোগাং হত্যাযজ্ঞস্থলে গিয়ে নিহতদের প্রতি সম্মান জানাতো নিজেদের সময়ে আর হত্যাকান্ড ঘটাবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিতো, তাহলেই আওয়ামী লীগ সরকার যে আগের নীতি থেকে

১ম পাতার পর

সরে এসেছে তা বুঝা যেতো। সমাধানের ব্যাপারে নীতিগত অবস্থান পরিস্কার করার পরবর্তী আবশ্যকীয় পদক্ষেপ হিসেবে পরিবেশ সৃষ্টির প্রসঙ্গটি আসে। রাজনৈতিক কারণে আটকাধীনদের নিঃশর্তে মুক্তি দেয়া, ষড়যন্ত্রমূলভাবে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করা, সেনামদদপুষ্ট দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী তথাকথিত PPSPC নামধারী গুন্ডাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া, প্রত্যাগত শরণার্থীদের নিকট প্রতিশ্রুত ১৬ দফা সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, সেনাবাহিনীর অপতৎপরতা বন্ধ করে পর্যায়ক্রমে ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া এবং বেআইনী বহিরাগতদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের মাধ্যমেই সত্যিকারভাবে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখের ও বেদনাদায়ক ব্যাপার হলেও এটা অতি বাস্তব সত্য যে- পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো পর্যন্ত প্রত্যাশিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। অধিকন্তু, শান্তি প্রক্রিয়ার বিপরীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে তা জনসাধারণকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। সরকার ও জনসংহতি সমিতির প্রতিটি বৈঠকের আগে ও পরে এমন সুক্ষ্ম পরিকল্পনার সাথে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তার পেছনে যে বিশেষ শক্তিশালী গোষ্ঠী জড়িত তা বুঝতে কারোর বাকী থাকে না। রাঙামাটিতে সবিনয় চাকমা আর খাগড়াছড়ির মাইসছড়িতে আদিশংকর খীসার হত্যাকান্ডের ঘাতকদের প্রকাশ্যে দেখা না গেলেও, গেল ২৭ জানুয়ারী খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারায় পিসিপি থানা সভাপতি অনিল চাকমাকে বর্বরোচিতভাবে মারধর ও থানায় সোপর্দ করার মধ্য দিয়ে "ঘাতক চক্রটির" মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। অপরাধী যতই সূক্ষভাবে বা দক্ষতার সাথে ঘটনা করুক না কেন, অপরাধের ছাপ রেখে যেতে বাধ্য। অনিল চাকমাকে ধরার মধ্য দিয়েই থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। (এ সংক্রান্ত সংবাদ দেখুন)

কোর্টে হাজিরা দান শেষে বাড়ী ফেরার পথে কোন আইন বলে সেনারা তাকে ধরতে পারে ? উপযাজক হয়ে পুলিশের দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা অপতৎপরতার ছবিটি ফুটে উঠে। শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করার ষড়যন্ত্র চল্‌ছে বলে জনমনে যে আশংকা দেখা দিয়েছিলো, সবিনয় চাকমা আর আদি শংকর খীসাকে হত্যা এবং অনিল চাকমাকে মধ্যযুগীয় কায়দায় মারপিট ও থানায় সৌপর্দ করার মধ্য দিয়েই তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়েছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধী কায়েমী স্বার্থবাদী এই গোষ্ঠীটির অপতৎপতা কঠোরভাব বন্ধ করা না গেলে, আলাপ-আলোচনা চললেও অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে থাকবে তা অতীত অভিজ্ঞতায় বলে দেয়।

অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ব্যাপারে লেঃ জেঃ নুরুদ্দীন খান (অবঃ) আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার যথেষ্ট মনোযোগের দাবী রাখে।

বিবিসি'তে দেয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত স্পেশাল এফেয়্যার্স ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লেঃ জেঃ নুরুদ্দীন খানের (অবঃ) ১৪ ফেব্রুয়ারীর সাক্ষাৎকারের সার কথা যেটি দাঁড়ায় তা হচ্ছেঃ আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন হবে ৫ জুলাই। তার আগে গেরিলাদের সাথে শান্তিচুক্তি হবে। সেনাবাহিনীকে পুরোদমে প্রত্যাহার না করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৮টি নিয়মিত সেনাশিবিরে রাখা হবে। বহিরাগতরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তঃসংসদীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ শেষে ১৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিমান বন্দরে ফিরে সাংবদিক সম্মেলনের বক্তৃতায় দৃঢ়তার সাথেই বলেন "অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে পরিস্থিতি জটিল করে বর্তমান সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ থেকে বিরত করা যাবে না, আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।" (সংবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারী '৯৭)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের এ ধরনের দৃঢ়তাকে নিঃসন্দেহে সাধুবাদ দিতে হয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের জন্য দু' দু'বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এখন এই সমাধানের উদ্যোগ নেবার কথা দৃঢ়তার সাথে বলার পাশাপাশি "সমাধানের রূপরেখা" প্রকাশ করাও অত্যন্ত জরুরী। না হলে, যেন তেন প্রকারে সমাধানের প্রচেষ্টা কিংবা উদ্যোগ আগের জেলা পরিষদের মতো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

জেঃ নুরুদ্দীনের সাক্ষাৎকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী আগের সরকারসমূহ থেকে ভিন্ন কিছু নয় সেটাই প্রকাশ পেয়েছে।

সশস্ত্র গোষ্ঠী কৃর্তক বান্দরবানে পুলিশ ও সেনাসদস্যের উপর হামলার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তি প্রক্রিয়া বিনষ্টকারীদের যোগসাজশ থাকার সন্দেহও প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাধান চায় না তারা প্রকাশ্য বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে মাঠে নেমেছে বলে অভিযোগ করেন এবং বান্দরবানের হামলার সাথে তাদেরও সংযোগ থাকতে পারে বলে খোলাখুলি মন্তব্য করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জিইয়ে থাকার পরিণতি হিসেবে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটছে। যা কারোরই কাম্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান করার সুযোগ এখন আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে। প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুষ্ঠু সমাধানের "রূপরেখা" প্রকাশ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আশা আকাঙ্খার সার্থক বাস্তবায়ন ঘটিয়ে তথা স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে সরকার এই সুযোগ কাজে লাতে পারে।

সত্যিকারভাবে সমস্যা সমাধানের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ না নিয়ে অহেতুক অন্যদের উপর দোষারোপ করে সরকার তার ব্যর্থতা ঢেকে রাখতে পারবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ঘোলাটে করে মাছ শিকারের দূরভিসন্ধি চলছে বলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। বহিরাগতদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হীন চক্রান্তের খবর ও আর গোপন কোন ব্যাপার নয়।

রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লুটার জন্য সাময়িকভাবে বৈঠক ভেঙে দিয়ে, আপন থালায় ঝোল টানার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন সরকার ও "মহলবিশেষ" মশগুল থাকতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহল আশংকা প্রকাশ করছেন।

তবে, এখানে মনে রাখা দরকার যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বোবা দর্শক মনে করে খেয়াল খুশী মতো কোন কিছু করতে যাওয়া ভুল হবে। আজকে যাদেরকে নীরব দর্শক মনে করে ধর্তব্যের মধ্যে নেয়া হচ্ছে না, সময়ে তারাই সরব হয়ে সমস্ত ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ভুন্ডুল করে দেবে। যারা নীরব দর্শক, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারাই জনগণ। আসল শক্তি তারাই।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এই নির্বাক জনতাই অত্যাচারী শাসকের মসনদ গুড়িয়ে দিয়ে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।

যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত থেকে বিরত থাকুন। পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোন ধরনের অঘটন হলে, তার দায়-দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে।

আর কালক্ষেপন না করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্যদাবী স্বায়ত্বশাসন মেনে নিন।

প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা কেমন আছেন?

১ম পাতার পর

অফিসার, ব্রিগেড ও সেনা জোন প্রভৃতি অফিসে ঘুরেছেন। বহু কষ্টে জমি ফেরত পাবার আশ্বাস পেলেও তিনি বাস্তুভিটায় যেতে পারেন নি। তাকে ক্যাম্পের দখলকৃত জায়গা থেকে কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেনা ক্যাম্পটি তুলে নেয়া হয়নি। একটা পরিবারের পক্ষে ক্যাম্পের পাশে বসবাস করা অসম্ভব। তাই কালাধন চাকমা ভারতে যেমন শরণার্থী ছিলেন। বর্তমানে স্বদেশে ফিরে এসেও শরণার্থীর মত স্থানচ্যুত হয়ে দুঃসহ জীবন অতিবাহিত করছেন। তার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

দীঘিনালা থানার রসিক নাগর কর্ব্বারী পাড়ার ৭৫ বছরের বৃদ্ধ রসিক নাগর চাকমার অবস্থাও একই। তিনি অনেক অফিস আদালত ঘুরেছেন, বহু কর্তা ব্যক্তির কাছে গেছেন। তবুও নিজ বাস্তুভিটা সহ ২৫ একর জায়গা জমি ফিরে পাননি। অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা তার জমি বেদখল করে আছে। বরং প্রশাসন থেকে জায়গা জমি বেদখল করে রাখতে অনুপ্রবেশকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। বর্তমানে রসিক নাগর বৃদ্ধ বয়সে অসহায়ভাবে অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে।

পানছড়ি থানায় কালানাল গ্রামে আজো পর্যন্ত ৩৩ পরিবার প্রত্যাগত শরণার্থী নিজ বাস্তুভিটায় যেতে পারেন নি। তাদের জায়গা জমি অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা দখল করে আছে। তৎসত্ত্বেও সরকারের গালভরা প্রতিশ্রুতি শুনে ১০/১১ পরিবার নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে যায়। কিন্তু ফেরত যাবার সপ্তাহ খানেক পরে জ্ঞান রঞ্জন চাকমার পনের বছরের কিশোরী কন্যাকে জনৈক অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মেম্বারের ভাইপোর হাতে ধর্ষিতা হয়। সে দিনই ভারত থেকে উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে 'জুম্ম রিফুজি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন" প্রতিনিধিদল ঐ এলাকায় পরিদর্শনে যায়। প্রতিনিধিদলের সাথে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ ইসমাইলও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ঘটনা অবহিত করা হলে জেলা প্রশাসক ঘটনার সুষ্ঠ বিচার হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দুই বৎসর অতিবাহিত হবার পরও এ ঘটনার কোন বিচার হয়নি। বরং উল্টো প্রশাসন ও সেনাবাহিনী থেকে নানা হুমকি দেয়া হচ্ছে ও হয়রানি করা হচ্ছে। বর্তমানে জ্ঞান রঞ্জন কোন মতে জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পানছড়ি থানার কানুনগো পাড়া, পায়ং কার্ব্বারী পাড়া, পোরাটিলা, মদন পাড়া, দীঘিনালা থানায় ছোট মেরুং, কালাচান মহাজন পাড়া, কবাখালী, বাবুছড়া ইত্যাদি জায়গায় এখনো প্রত্যাগত শরণার্থীরা নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে পারেনি। সরকারের ১৬ দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারটিও ছিল। অর্থাৎ যে সকল শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে তাদের বিরুদ্ধে যদি মামলা, হুলিয়া থাকে তাহলে তা তুলে নেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে হলো তার

৫ পাতায় দেখুন

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাহাড়ীদের হৃদয়েও বেঁচে থাকবেন

-সম্পাদক মণ্ডলী

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও উপন্যাসিক, বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সহসভাপতি ও তৃণমূল পত্রিকার সম্পাদক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গত ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকার একটি ক্লিনিকে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর মাত্র ৫৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার এই অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাভিভূত।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের লেখক। একজন সমাজ সচেতন, দায়িত্ববান ও প্রগতিশীল লেখক। তাঁর লেখার মাধ্যমে সমাজের সমকালীন চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "চিলেকোঠার সেপাই" ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার অপর এক উপন্যাস খোয়াবনামা আনন্দ পুরস্কার লাভ করে। তাঁর সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ।

তার সাহিত্য কর্মের ওপর আলোচনা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। একজন প্রকৃত মানবতাবাদী লেখক হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জাতিসত্ত্বাসমূহের মুক্তি সংগ্রাম, তাদের অবস্থা ও সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি কি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা এবং তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এই লেখার অবতারণা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছিল ঘনিষ্ট যোগাযোগ। তিনি কয়েকবার ওই এলাকা সফর করেন এবং সেখানকার পাহাড়ী মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন। প্রথম ১৯৮১ সালে তিনি রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান যান। পরে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে পাহাড়ী গণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আমন্ত্রণে বৈসাবি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আরো অনেকের সাথে সহযাত্রী হয়ে খাগড়াছড়ি যান। কিন্তু সে সময় ১০ এপ্রিল লোগাং গণহত্যা সংঘটিত হলে বৈসাবি'র আনন্দ উৎসব শোক ও কান্নায় পর্যবসিত হয়। তিনিও পাহাড়ীদের সাথে সমব্যথী হন। এর পরেও তিনি বেশ কয়েকবার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনাবাহিনী ও শাসক শোষক শ্রেণী কর্তৃক পাহাড়ী জনগণের ওপর যে নির্মম নিপীড়ন নির্যাতন অব্যাহতভাবে চলছে তার বিরুদ্ধে ছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দৃঢ় অবস্থান। হিল লিটারেচার ফোরামের সাড়া জাগানো প্রকাশনা বর্তমানে নিষিদ্ধ 'রাডারে" তিনি এক সাক্ষাতকার দেন। সেখানে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী নীতির সমালোচনা করেন এবং পাশাপাশি পাহাড়ীদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতনের প্রতি উদাসীন থাকার দায়ে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, "এই দেশের ছোট জাতিসত্ত্বাগুলির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীকে নস্যাৎ করার জন্যে যখন নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলে তখন ঐ লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের উদাসীনতা শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জার বিষয়ও বটে।" এরপর তিনি বলেন "যেখানে পৃথিবীর যে কোন প্রন্তের সংস্কৃতি বিপন্ন হলে যে কোন শিল্পী তাতে উদ্বেগ বোধ না করে পারে না, সেখানে আমাদেরই কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখী হলে সমগ্র জাতির স্বার্থেই তাদের এর প্রতিকারে উচ্চকণ্ঠ হওয়া উচিত।"

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত দরিদ্র সর্বহারা বাঙালীদেরকে যে শোষণ নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সচেতন। সাক্ষাতকারে তিনি এ সম্পর্কে বলেন, "পাহাড়ীদের জমিতে জোর করে যাদের বসানো হচ্ছে তাঁরা হলেন নিরীহ ও গরিব বাঙালী কৃষক। এঁদের প্রতি কোনো ভালোবাসা থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পাহাড়ীদের উচ্ছেদ করার জন্যে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। পাহাড়ীদের যদি নিশ্চিহ্ন করা যায় তো তার পর পরই এদেরও এসব জমি থেকে নির্মূল করা হবে, ঐ জমি দখলের জন্যে হামলে পড়বে দেশের ধনী, বুর্জোয়া সুবিধাভোগীর দল"। তিনি নির্যাতিত পাহাড়ী এবং শোষিত ও প্রতারিত বাঙালীকে ঘনিষ্ট আত্মীয় হিসাবে দেখেন এবং উভয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, "নির্যাতিত ও শোষিত পাহাড়ি এবং নির্যাতিত, শোষিত ও প্রতারিত বাঙালী শ্রমজীবী অনেক ঘনিষ্ট আত্মীয়। এই সত্যটি সবার মধ্যে উপলব্ধি করাবার দায়িত্ব বাঙালী ও পাহাড়ী লেখক, শিল্পী ও রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর। এখন বাঙালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অত্যন্ত কম। এটা খুব দুঃখজনক। উভয় সংস্কৃতির জন্যেই এটা ক্ষতিকর। পরস্পরের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরস্পরকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। পরস্পরকে না চিনলে কেউ কারো সমস্যা বুঝতে পারবেন না; শুধু তথ্য জেনে কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিসত্ত্বার সমস্যা সম্বন্ধে কেউ উদ্বিগ্ন হতে পারে না।"

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাহাড়ীদের পুরাতন লোকসাহিত্য সমকালীন সাহিত্য ও বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার ভাষার রূপ সম্পর্কে যথেষ্ট জানতেন। তিনি মনে করতেন যে, বর্তমানে চাকমা ভাষায় উপন্যাস রচনা করা সম্ভব। তাই তিনি ১৯৯৩ সালে "চাকমা উপন্যাস চাই" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যা "সংস্কৃতি" নামক পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল।

গভীর চিন্তা উদ্রেককারী এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "কবিতা হলো মানুষের অনুভূতির সারাৎসার। চাক্‌মা কবিতা থেকে তাদের বেদনা ও ক্রোধ বেশ আঁচ করা যায়। কিন্তু তাদের নিত্য দিনের জীবন যাপন এবং এর পটভূমিতে ভাবনা ও প্রতিক্রিয়াকে না পেলে তাদের সামগ্রিক চেহারা দেখবো কি করে? চাক্‌মা সমাজে আধুনিক ব্যক্তির উত্থান ঘটেছে বলেই তো জাতিগত অপমান তাদের গায়ে এভাবে লাগে; প্রত্যেককে স্পর্শ করে ব্যক্তিগতভাবে। তো এই আধুনিক ব্যক্তিকে সামজের ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে এবং প্রতিবাদ, অসন্তোষ ও প্রতিরোধের ভেতর জানতে হলে উপন্যাস ছাড়া আর কোন উপযুক্ত মাধ্যম আছে কি?"

শেষে তিনি লেখেন, "উপন্যাস কোনো সমস্যার সমাধান দেয় না, কিন্তু মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার দিকে ইংগিত দেখায়। বঞ্চিত, অপমানিত ও নিগৃহীত চাক্‌মার সংকটে ও সংগ্রামে উপন্যাস তাকে প্রতিফলন করার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনবোধকে পরোক্ষভাবে হলেও সংগঠিত করতে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করি।

"চাক্‌মা সামাজে ব্যক্তি উদ্বোধনের এই ক্রান্তিলগ্নে চাকমা ভাষা ও চাক্‌মা জাতি আজ উপন্যাসের প্রতীক্ষা করছে। অনুপ্রাণিত ও দায়িত্বশীল চাক্‌মা শিল্পি কি মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির এই তৃষ্ণা মেটাবার উদ্যোগ নেবেন না?"

সমাজ ও ভাষার বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে উপন্যাসের সৃষ্টি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনে করতেন চাকমা ভাষাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আরো কিছু ভাষায় উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোনো এক লেখকের হাত দিয়ে চাক্‌মা উপন্যাসের জন্ম হবে। দুঃখ থাকবে ইলিয়াস তা দেখে যেতে পারলেন না।

শেষে বলতে চাই, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাহাড়ী জনগণের এক অকৃত্রিম বন্ধু। মুক্তিকামী পাহাড়ী জনগণ তাঁকে এবং তাঁর মহান অবদানকে সব সময় মনে রাখবে। তাঁর অমূল্য সাহিত্য কর্মের মধ্যে এদেশে তিনি অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকবেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সম্পাদকীয়

অনেক জল্পনা-কল্পনা ও আশা-আশংকা সৃষ্টি করে নাটকীয়ভাবে ২৫-২৭ জানুয়ারী রাজধানী ঢাকায় জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়ে গেলো। ১৯৮৫ সাল থেকে সংলাপ প্রক্রিয়া শুরু হলেও (মাঝপথে ১৯৮৯ সালে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলে সংলাপ ভেঙে যায়) এই প্রথম জনসংহতি সমিতি নেতাদের রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে রেখে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। বরাবরের মতো ঢাকার এই আলোচনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে বলে সরকার পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু বৈঠকে আসলে কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বা কোন কোন বিষয়ে মতৈক্য ও মতানৈক্য রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানানো হয়নি। তাছাড়া গত বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে সমাধানের একটি রূপরেখা উপস্থাপনের কথা থাকলেও তা করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সম্পর্কে সরকারের মনোভাব এখনো অস্পষ্ট থেকে গেছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বিবিসি'র সাথে সাক্ষাতকারে সেনাবাহনী ও বহিরাগতদের সম্পর্কে প্রদত্ত জেঃ নূরুদ্দীন খানের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিগত স্বৈরাচারী এরশাদ ও খালেদা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিগত বিষয়ের সাথে বর্তমান সরকারের কোন পার্থক্য নেই।

ভূমি সমস্যা, সেনাবাহিনী ও বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী এই তিনটি ইস্যু একটি অপরটির সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পাহাড়ীদের বেদখলকৃত জমি ফিরিয়ে দেওয়া ও ভূমির উপর জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যদি নীতিগতভাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিরাগতদের ফিরিয়ে এনে অন্যত্র সম্মানজনক পুনর্বাসন একান্ত জরুরী। আর সমস্যার সমাধান হলে সেনাবাহিনীর পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করার কোন প্রয়োজন ও ভিত্তি থাকতে পারে না। কাজেই সমাধানের লক্ষ্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহের সামগ্রিক বিবেচনা করতে হবে এবং জুম্ম জনগণের আশা আকাংখাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে যে, সরকার স্বৈরাচারী এরশাদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তথাকথিত জেলা পরিষদের অনুরূপ সমাধানেই আগ্রহী। এই যদি হয়ে থাকে, তাহলে কোথায় অগ্রগতি? কেন এত উচ্ছসিত আশাবাদ? বিগত পর পর দুইটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ওয়াদা ছিল, রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রারেম সমস্যার সমাধান করা। এই কথার অর্থ এই যে, স্বৈরাচারী এরশাদের চাপিয়ে দেয়া জেলা পরিষদ রাজনৈতিক সমাধান নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার আবার জেলা পরিষদ ব্যবস্থা নতুনভাবে জুম্ম জনগণকে হজম করতে বাধ্য করছে কেন? কিছুদিন আগেও হাসিনা বলেছিলেন যথা সময়ে জেলা পরিষদের নির্বাচন হবে। আবার বিবিসি'র সাথে ঐ সাক্ষাতকারে নূরুদ্দীন খানও জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তির পর ৫ই জুলাই জেলা পরিষদের নির্বাচনের কথা বলেছেন। এসব কিসের ইঙ্গিত বহন করে? সরকারের খেয়াল রাখা দরকার, এই জনবিরোধী জুম্ম জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী জেলা পরিষদ ব্যবস্থা পাহাড়ী জনগণ সমাধান হিসাবে পূর্বেও মেনে নেয়নি এবং ভবিষ্যতেও নেবে না।

গোটা সংলাপ প্রক্রিয়ায় সরকার পক্ষের আচার আচরণ ও আওয়ামী লীগ নেতাদের বিভিন্ন বক্তব্য বিশ্লেষন করলে বোঝা যায় যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের বহু বছরের মুক্তি সংগ্রামকে খুব অল্প দামে কিনতে চাচ্ছেন। এই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ যে কৌশল নিয়েছে তা হচ্ছে একজন "ব্যাপারীর" কৌশল। পার্বত্য চট্টগ্রামের হাটে বাজারে এইসব ব্যাপারীরা যেভাবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, পিট চাপরিয়ে দিয়ে ভালো মানুষ সেজে সরলপ্রাণ জুম্মদের কাছ থেকে সস্তাদরে জিনিসপত্র কিনে নেয়, আওয়ামী লীগও সামান্য কিছু রাজনৈতিক ছাড় দিয়ে এবং লোক দেখানো বাহ্যিক আন্তরিকতা, চাকচিক্য দেখিয়ে জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে কানাগলিতে টেনে নেবার ষড়যন্ত্র করছে। কিছু কিছু ব্যক্তি বিশেষের এইসব মিষ্টি কথা ও বাহ্যিক আন্তরিকতায় মোহ থাকতে পারে কিন্তু জনগণ সরকারের পাতানো ফাঁদে পা দেবে না। সরকারের এই পাতানো খেলায় সহায়তা দেবার জন্য পাহাড়ীদের মধ্য থেকেও কিছু ব্যক্তি বিশেষ ইদানিং মাঠে নেমেছে। কিছু উচ্ছিষ্ট পাওয়ার লোভে তারা সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে সমাধানের জারীগান গাইছে। জনগণকে এদের ব্যাপারেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

[স্বাধিকার নিয়মিত বের করার জোর প্রচেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে স্বাধিকার বিলি বিক্রির কাজে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ, এজেন্ট, প্রতিনিধি,পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও তিন সংগঠনের প্রতিটি কর্মীর সক্রিয় ও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। দ্রুত স্বাধিকার বিক্রি করে বিক্রিত লব্ধঅর্থ ডাক যোগে অথবা বিশ্বস্ত লোক মারফত "স্বাধিকার প্রকাশনা দপ্তর, ৪৭০ জনন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা" এই ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।]

ফেলে আসা দিনগুলি (১)

সংগ্রামের ডায়েরী

- দীপায়ন খীসা

আন্দোলন সংগ্রামে আমার বয়স অবশ্য এখনো তেমন বেশী হয়নি। বলতে গেলে রাজনীতিতে এখনো পুরোপুরি সাবালক হয়ে উঠতে পারিনি। কাজেই অভিজ্ঞতার ঝুলিও নেহায়েত কম। আসলে আন্দোলনে আমার অভিজ্ঞতা বলতে কারাগারের কিছু স্মৃতি। তাই আমার এ লেখা মূলতঃ কারাগারের দিনগুলি নিয়েই।

এ পর্যন্ত দু'বার কারাগারে যাবার সৌভাগ্য (!) হয়েছে আমার। প্রথমবার প্রায় দু'বছর কারাগারে ছিলাম। সেই সুবাদে বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার দেখার দুর্লভ সুযোগ হয়েছে।

'৯০ এর শেষের দিকে ৫ অক্টোবর প্রথম বারের মতো আমাকে গ্রেফতার করা হয়। স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের চূড়ান্ত আন্দোলন দানা বাঁধছিল তখন। সেদিন ছিল প্রবারণা পূর্ণিমা। বান্দরবানে বেশ হৈ-হল্লা ও ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। বান্দরবানের ঐতিহ্যবাহী রথ টানা উৎসবে শরীক হওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হই। পথিমধ্যে অকস্মাৎ একদল সাদা পোষাকধারী পুলিশ আমাকে মধ্যমপাড়া নামক স্থানে আটকায় এবং থানায় নিয়ে যায়। তখনও বুঝতে পারিনি যে আমাকে গ্রেফতার করা হবে। থানায় গিয়ে দেখি ওসি'র টেবিলের ওপর আমার লেখা একটা ছোট্ট প্রবন্ধ। এবার বুঝতে পারলাম কি জন্যে আমাকে নিয়ে আসা হলো। যাই হোক, প্রবন্ধটি ছিল জন সংহতি সমিতির প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসনের স্বপক্ষে কিছু বিশ্লেষণ এবং তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত জেলা পরিষদের অগ্রহণযোগ্যতা নিয়ে।

এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা একান্ত দরকার সেটা হলো, তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার এবং সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে জেলা পরিষদ ব্যবস্থা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। সে সময় সেনাবাহিনী ও তাদের পদলেহনকারী দালালদের ভয়াবহ অত্যাচার ও দমন পীড়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জনপদে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছিল। তা সত্বেও জেলা পরিষদ নির্বাচন প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হয় সমগ্র পার্বত্যবাসী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সে সময় বান্দরবানে পিসিপি'র বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক নেতা জুম্ম জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং জাতীয় বেঈমান সেনাবাহিনীর পদলেহনকারী সাচিং প্রু জেরীর সমর্থনে রাতদিন নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত থাকে। কারাগারে বন্দী দিনগুলোতে এ স্মৃতি আমাকে বার বার পীড়া দিয়েছিল, এখনো দেয়। আটক হওয়ার বেশ কয়েক মাস পর বিচারের জন্য বান্দরবান থেকে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে আমাকে স্থানান্তরিত করা হয়। এরই মধ্যে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হয়েছে এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। চারদিকে বেশ আনন্দের জোয়ার। স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনের ঢেউ দেশের কারাগারগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের দমন-পীড়ন, শম্বুক গতি বিচার ব্যবস্থা, কারা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, অনিয়ম এসবের বিরুদ্ধে কারাগারগুলোতে বিদ্রোহ শুরু হলো। অবশ্য কর্তৃপক্ষ আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল, গুলিও চালানো হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম কারাগারেও বন্দীরা বিদ্রোহ করে। প্রায় তিন মাস ধরে কারাগারের নিয়ন্ত্রণ বন্দীদের হাতে ছিল।

চট্টগ্রাম কারাগারে এসে অনেক জুম্ম বন্দীর সাথে পরিচয় হলো। অনেকে ৫/৬ বছর ধরে কারাবাস করছিলেন। সকলে আমার মতো রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায় অভিযুক্ত। কারাগারের মধ্যে থেকেও চেষ্টা করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে। আমরা প্রায়ই আলোচনায় বসতাম, পরিস্থিতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতাম। বিশেষ করে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বইগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। মাস্টারদা, প্রীতিলতা, অনন্ত সিংহ, আম্বিয়া চক্রবর্তী প্রমূখ বিপ্লবীদের বীরোচিত আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাত। মহান নেতা এম.এন. লারমার মৃত্যু বার্ষিকীও পালন করা হতো প্রতিবছর, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে।

অতকিছুর পরও মুক্তির আকাংখা বিরাজ করতো সব সময়। মুক্ত হওয়ার কয়েকদিন আগের কথা বেশ মনে পড়ে। তখন সুজন ও টুলুর মামলার রায় হয়েছে। উভয়ে যাবজ্জীবন দন্ডে দন্ডিত হয়েছে। তার কয়েকদিন বাদে আমার মামলার রায় হবে। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছিলাম রায় ঘোষণার দিনটির জন্য। অবশেষে আমাকে আদালতে হাজির করা হলো। বিচারক রায় ঘোষণা করবেন। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম। বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের কথা মনে পড়লো। যুগ যুগ ধরে ভাগ্য বিড়ম্বিত নিপীড়িত জুম্ম জনগণ ও মেহনতি মানুষের মুক্তির শপথের কথা স্মরণ করে মনকে শক্ত করলাম। সংগ্রামের এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি যেন।

সংগঠন সংবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সুপারিশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংক্ষণ কমিটি সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার চলমান সংলাপ ও তা ঢাকায় অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছে।

গত ২০ জানুয়ারী মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে কমিটির আহ্বায়ক ব্যারিষ্টার লুৎফর রহমান শাহজাহানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আনু মুহাম্মদ, মোস্তফা ফারুক, আবু সাঈদ খান, আদিলুর রহমান খান, এ্যাডভোকেট নিজামুল হক, প্রসিত খীসা, সঞ্চয় চাকমা প্রমুখ। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় -

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সংখ্যালঘু জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৩. পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যার সমাধান।

৪. শরণার্থী সমস্যার সমাধান ও নিরাপত্তা প্রদান এবং ৫. কল্পনা চাকমা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান।

সভায় আশা প্রকাশ করা হয় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলি যথাযথ সমাধানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করতে সংশ্লিষ্ট সকলে উদ্যোগী হবেন।

পিসিপি নেতা অনিল বিকাশ চাকমা গ্রেফতার

॥ স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥

গত ২৭ জানুয়ারী খাগড়াছড়ি কোর্টে হাজিরা দেয়ার পর বাড়ী ফেরার পথে গুইমারা ব্রিগেড কমাণ্ডারের নির্দেশে সেনারা পিসিপি গুইমারা থানা শাখার সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমাকে গ্রেফতার করে ব্রিগেড অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে সারা রাত মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর করা হয়।

পরের দিন সেনারা তাকে গুইমারা থানায় হস্তান্তর করে এবং সেখানে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলকভাবে অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর-৩ ২৮/১/৯৭ (জি.আর. ১৬/৯৭ গুইমারা)। থানা থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। পরে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি সাব জেলে প্রেরণ করা হয়।

অনিল চাকমার আত্মীয় স্বজন কোর্টে জামিনের আবেদন করলে সেনা কর্তাদের চাপের কারণে কোর্ট তা নামঞ্জুর করে। জানা গেছে, জামিনের ব্যাপারে সেনাবাহিনী দুইটি শর্ত আরোপ করে ঃ "অনিল চাকমা তার জন্মস্থান গুইমারা যেতে পারবে না বা থাকতে পারবে না। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ করতে পারবে না"।

উল্লেখ্য, গুইমারার অনিল চাকমা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অপকর্ম ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এজন্য তিনি গুইমারা ব্রিগেডের সেনা সদস্যদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। গ্রেফতারের পূর্বে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দারা তার উপর কড়া নজর রাখতো এবং বাড়ীতে গিয়ে অহেতুক হয়রানি করতো। ইতিপূর্বে সেনাবাহিনীর সদস্যারা তাকে আরো একবার গ্রেফতার করেছিলো।

পি.সি.পি মেরুং ইউনিয়ন শাখা গঠিত

স্বাধিকার রিপোর্টার ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মেরুং ইউনিয়ন শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারী মেরুং ইউনিয়নের লাম্বাছড়া গ্রামে ছাত্রনেতা প্রদীপ চাকমার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পি.সি.পি কেন্দ্রীয় কমিটির ছাত্র নেতা অনিমেষ চাকমা, নিকোলাস চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয় শাখার উজ্জ্বল চাকমা, দীঘিনালা থানা শাখার ধর্মজ্যোতি চাকমা ও সিন্ধু বিকাশ চাকমা।

পরে সুজয় চাকমাকে সভাপতি, দেবস্মৃতি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে এগার সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটি ঘোষণা ও শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমা, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জীব কান্তি চাকমা।

অব্যাহত সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকায় সমাবেশ

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ অনিল চাকমাকে গ্রেফতার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত সেনা নির্যাতনের প্রতিবাদে পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথ ভাবে গত ৩০ জানুয়ারী ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

সকাল ১১টায় মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, টি.এস.সি চত্বর প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয়। প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশে তিন সংগঠনের নেতারা বলেন- একদিকে সমস্যা সমাধানের নামে আলোচনা বৈঠক আবার অন্য দিকে নিরীহ জনগণের উপর সেনাবাহিনীর হয়রানি, নিপীড়ন, নির্যাতন, তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মিথ্যা মামলা ও ধরপাকড় সরকারের দু'মুখী নীতিরই বিহঃপ্রকাশ। বক্তারা অবিলম্বে সাংবিধানিক গ্যারান্টি সহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত আনার দাবী জানান।

সভায় অবিলম্বে অনিল চাকমাকে নিঃশর্ত মুক্তিসহ ক্ষতিপূরণের দাবী জানানো হয়। সমাবেশে রবিশংকর চাকমা , সঞ্চয় চাকমা, দীপ্তি শংকর চাকমা, কবিতা চাকমা, ক্যহলা চিং মারমা, মংসানু মারমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

স্বাধিকার রিপোর্টার ॥ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঘিলাছড়ি ইউ.পি শাখার তৃতীয় বার্ষিক কাউন্সিল ঘিলাছড়ি বাজার মাঠে সম্পন্ন হয়েছে।

৪ জানুয়ারী সকাল ১১টায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কাউন্সিল শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জ্ঞান রঞ্জন চাকমা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন - পি.সি.পি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক নিকোলাস চাকমা, প্রাক্তন ইউ.পি চেয়ারম্যান কর্মফল চাকমা, স্থানীয় মুরুব্বী নেহার বিন্দু চাকমা, অভিলাষ চাকমা, টিটন খীসা, তাপস ত্রিপুরা, বিনয় কৃষ্ণ চাকমা, উথোয়াই চিং মারমা, জয় মোহন চাকমা ও জ্ঞান বিকাশ চাকমা।

কাউন্সিলে মতি বিকাশ চাকমাকে সভাপতি, জ্ঞান বিকাশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং পলাশ চাকমা কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটি ঘোষণা ও শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় নেতা নিকোলাস চাকমা।

পরিপূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত নারী মুক্তি অর্জিত হতে পারে।

এলাকা সংবাদ

সেনাবাহিনীর ধর্ম অবমাননা বিহারে অহেতুক তল্লাশি

॥ নিজস্ব সংবাদদাতা ॥

ভিক্ষুক ওয়েন্দিকা মহাথেরো (৮৭) এর মৃত্যুর পর ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় তার সৎকার্য সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গত ১লা জানুয়ারী রিয়ং মরম বৌদ্ধ বিহারে আলোচনা কালে গুইমারা ব্রিগেডের সেনা জোয়ানরা হামলা চালায় এবং একজনকে ধরে নিয়ে যায়।

ঘটনার দিন গুইমারা ব্রিগেডের ২৪ আর্টিলারীর সেনা জোয়ানরা বিহারটিকে ঘিরে ফেলে এবং বিহারে জুতাপায়ে প্রবেশ করে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায়। পরে সবাইকে উঠানে লাইন করে দাঁড়াতে বলে এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে চাকমা সম্প্রদায়ের কেউ থাকলে হাত উঠানোর নির্দেশ দেয়। সেখানে কোন চাকমা না থাকায় কমাণ্ডার মন্তব্য করে - "চাকমারা খুব দুষ্ট"। চাকমা সম্প্রদায়ের কাউকে না পেয়ে পরে সেনারা দোঅংগ্য মারমা (২৮) কে গুইমারা ব্রিগেড ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তাকে ক্যাম্পে নির্যাতন চালানো হয় ও রাত্রে গর্তে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়। সেনা জোয়ানরা বিহার থেকে সাড়ে আট কেজি ওজনের ইংরেজী পেপার (ভান্তের সৎকার্য্যে ব্যবহারের জন্য) নিয়ে যায়। সেনাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত কথাবার্তা ও পবিত্র বিহারের অবমাননার ঘটনায় এলাকায় তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

যুদ্ধ বিরতির সুযোগে মেজর শামছু কর্তৃক নতুন ক্যাম্প স্থাপন ও ভূমি বেদখল

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ যুদ্ধ বিরতির শর্ত লংঘন করে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী নতুন সেনাক্যাম্প নির্মাণ ও জুম্ম ভূমির ওপর বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত রেখেছে।

গত ডিসেম্বরে রাঙ্গামাটি জেলায় ২১ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঘনমুড়া আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর শামছু দু'ব্যক্তির জমি জোরপূর্বক দখল করার পর উক্ত জমিতে ক্যাম্প স্থাপন ও কয়েক'শ অনুপ্রবেশকারীকে বসত দানের প্রক্রিয়া হাতে নেয়। উক্ত মেজর ২২ ও ২৬ ডিসেম্বর '৯৬ জমির মালিকদেরকে ক্যাম্পে ডেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করে এবং এটা প্রকাশ না করার হুমকি দেয়। অন্যথায় গুলি করে মেরে ফেলা হবে বলে জানিয়ে দেয়। যে দু'ব্যক্তির জমি বেদখল করা হয়েছে তারা হলেন সুবল্যা চাকমা পীং ঝাগামুয়্য চাকমা গ্রাম : নোয়াপাড়া, বরকল ও প্রীতিবিন্দু দেওয়ান পীং গজেন্দ্র লাল দেওয়ান, গ্রাম : মাছছড়ি, লংগদু।

উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারী এলাকার জনসাধারণ ভুমি বেদখল ও ক্যাম্প স্থাপনের বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সমীপে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। কিন্তু এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এলাকার জনগণ সুবিচারের আশায় রয়েছেন।

সেনা কর্তৃক অকথ্য নির্যাতনের পর মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ পাইন্দং পাড়া, গুইমারাঃ সিন্দুকছড়ি সেনা জোনের ৩ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ান নায়েক (১৪৩১-৬০১) মোঃ হুমায়ুন কবির বড়চোগা চাকমা (৪৭) ও তার পুত্র বত্তাইয়া চাকমা (২২) কে পাঁচ দিন বন্দী অবস্থায় অকথ্য নির্যাতনের পর ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে গত ১৭ ডিসেম্বর '৯৬ মামলা দায়ের করে। মামলা নং জি.আর-২৯৫/৯৬।

ইতিপূর্বে ১২ ডিসেম্বর ভোর রাত আনুমানিক ৪টায় গুইমারাস্থ ২৪আর্টিলারী ব্রিগেড ও সিন্দুকছড়ির ৩ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ান যৌথভাবে পাইন্দং পাড়ায় অভিযান চালায়। সেনারা উক্ত দুই জনকে নিজ বাড়ী থেকে ধরে গুইমারা ব্রিগেডে নিয়ে আসে।

মামলা রজুর পরের দিন ১৮ ডিসেম্বর ৩ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ানের ক্যাপ্টেন মামুন নাক্ষ্যা পাড়ার সেনা সাব-জোনের জোয়ান নিয়ে পুনরায় অভিযান চালিয়ে আটককৃত ব্যক্তিদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। ফেরার পথে এলাকার বজেন্দ্র কার্ব্বারীর জুমের খামার বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।

এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে পাইন্দং পাড়ার এলাকাবাসীর পক্ষে কার্ব্বারী শুক্ররাজ্য চাকমা ২৫ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্‌র কাছে এক স্মারকলিপি দেয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় "বর্তমানে একদিকে শান্তির বৈঠক চলছে আর অপর দিকে সেনা অপারেশন অব্যাহত রেখে আমাদের নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। এরকম ন্যাক্কারজনক ভূমিকা মোটেই কাম্য নয়। আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এ ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি প্রদান, গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি ও চিকিৎসা প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দাবী জানাচ্ছি"।

এ প্রতিবেদন তৈরী করা পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে উক্ত ঘটনার কোন তদন্ত বা বিহীত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত স্বাধিকার ৩ নং বুলেটিনে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ হয়রানি

গত ৮ই জানুয়ারী আনুমানিক রাত ৯টায় আজনটিলা সাব জোনের সেনারা গোমতি এলাকায় হানা দেয়। সেনা জোয়ানরা রণ্ড মোহন ত্রিপুরা পিতা ঃ সান কুমার ত্রিপুরা ও শশি মোহন ত্রিপুরা পিতাঃ তীগেন্দ্র লাল ত্রিপুরা কে তাদের নিজ বাড়ী থেকে গ্রামের কার্ব্বারী মোহন ত্রিপুরার বাড়ীতে ধরে নিয়ে আসে। সেনারা তাদেরকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অহেতুক হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিলেও বর্তমানে তাদেরকে সপ্তাহে একদিন করে আজনটিলা সাবজোনে হাজিরা দিতে হয়। রণ্ড মোহন ত্রিপুরাদের কি অপরাধ তারা তা জানে না।

রাঙামাটিতে সেনাবাহিনীর জুম্ম উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ ১৪ জানুয়ারী সকাল ৭টার দিকে বসন্তপাড়া আর্মি ক্যাম্প থেকে একদল সেনা লেঃ মুসার নেতৃত্বে লক্ষণ্যা পাড়ার দিকে ব্রাশ ফায়ার করতে করতে পাড়ায় প্রবেশ করে। সেনারা পাড়ার একটি বাড়ী থেকে সকলকে বাহির হতে নির্দেশ দেয় এবং ৮৫ বছরের বৃদ্ধ লক্ষণ্যা চাকমার কাধেঁর উপর এল.এম.জি বসিয়ে আবারো ব্রাশ ফায়ার করে। এতে বৃদ্ধের কানের পর্দা ফেটে যায়। তিনি এখন শুনতে পান না। সেনারা বাড়ীর একটি কুকুরকে গুলি করে মারে। গ্রাম ছেড়ে চলে না গেলে সবার পরিণতি কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরতে হবে বলে কঠোর হুশিয়ারী দিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, বসন্তপাড়া ক্যাম্পের সেনারা ৪ জানুয়ারী উক্ত পাড়ায় একবার হানা দিয়েছিলো। সেনারা গ্রামবাসীদের অহেতুক হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে। সে সময় মিত্র চাকমা (২২) নামে এক গৃহ শিক্ষককে হেনস্তা করা হয়, তাকে শান্তিবাহিনী সন্দেহে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগও নেয়া হয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা সকলেই শিক্ষককে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সেনাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করে। পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে সেনারা চলে যাবার সময় নির্দেশ দিয়ে যায় ৫/৬ দিনের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে। অন্যথায় তাদেরকে গুলি করে মারা হবে বলে হুমকি দেয়।

এ ঘটনা স্থানীয় ইউ.পি চেয়ারম্যানকে জানানো হয়। তিনি ঘটনাটির ব্যাপারে উক্ত ক্যাম্পে যোগাযোগ করলে কমান্ডার চেয়ারম্যানের কাছে ভুল স্বীকার করে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৫০০ টাকা দেয়। বর্তমানে গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকার পর ফিরে এলেও ভয়ভীতি কেটে যায়নি। বসন্তপাড়া আর্মি ক্যাম্পের সেনাদের অব্যাহত অত্যাচারে লক্ষণ্যাপাড়াবাসীরা অনিশ্চয়তা ও আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

এ.এস.আই এর ৩০০০ টাকা দাবী অধিপূর্ণ ত্রিপুরার ১০০ আড়ি ধান তছনছ

॥ স্বাধিকার রিপোর্ট ॥

গুইমারাস্থ ২৪ আর্টিলারী ব্রিগেডের অধীন তৈই কাঠাং সেনা ক্যাম্পের জোয়ানরা ২৪ ডিসেম্বর আনুমানিক সকাল সাত টার দিকে হরিপূর্ণ কার্ব্বারী পাড়ার অধিপূর্ণ ত্রিপুরার (৫০) বাড়ীতে হানা দেয়।

সারা বছরের খোরাকের জন্য সংগৃহীত ১০০ আড়ি ধান সেনারা নষ্ট করে দেয়। শান্তিবাহিনীর ধান অভিযোগ করে, অস্ত্র তল্লাসীর নামে ধানের গোলা (ধান সংরক্ষণাগার) কেটে উঠানে যত্রতত্র ছিটিয়ে দেয়।

এ ঘটনার পর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ২ জানুয়ারী মাটিরাঙ্গা থানার এ.এস.আই মোঃ আকবর হোসেন অধিপূর্ণ ত্রিপুরাকে তার ছেলে নগেন্দ্র নাথ ত্রিপুরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাদের জন্য ৫ জানুয়ারী রবিবার সকাল দশটার মধ্যে থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়।

থানায় দেখা করলে এ.এস.আই মোঃ আকবর হোসেন অধিপূর্ণ ত্রিপুরার কাছ থেকে ৩০০০ টাকা দাবী করে। সময়মত উক্ত টাকা না দিলে তাকে ও তার ছেলেকে গ্রেফতার অথবা অন্য কোন অঘটনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বলে কড়া ভাবে শাসায়। বর্তমানে অধিপূর্ণ ত্রিপুরা অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

সংশোধনী

স্বাধিকার ৩য় সংখ্যায় "পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাধান ঃ আশা-আশংকা" শিরোনামে প্রকাশিত রাজনৈতিক নিবন্ধে ভুল বশতঃ খাগড়াছড়ি জেলার হাফছড়ি নামক মারমা অধ্যুষিত এলাকায় ২১-২৩ নভেম্বর এক হামলায় ৩০টির অধিক বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়া হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। আসলে কোন বাড়ীতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেনি। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। [রাজনৈতিক ভাষ্যকার]

ভিডিপি প্লাটুন কমান্ডারের কাণ্ড !

ভিডিপি প্লাটুন কমাণ্ডার মোঃ আলীর দাপতে গোমতি এলাকার জুম্মো জনগণ অতিষ্ঠ। জুম্মোরা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহ কোন কিছু করতে গেলেই তার অনুমতি নিতে হয়। জানা গেছে, প্লাটুন কমাণ্ডার গোমতি জোন কমাণ্ডারের সাগরেদ। বসের নির্দেশে নাকি উক্ত ভিডিপি এই ধরনের অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

আজনটিলা সাব জোনের হয়রানি অব্যাহত

গত ১১ জানুয়ারী আজনটিলা সাব-জোনে পাঁচ ব্যক্তিকে ডেকে হয়রানিমূলক অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেনারা "শান্তিবাহিনীকে কত হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে? শান্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ আছে কিনা"? ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে। আর হুমকি দেয়, এ গুলোর যে কোন একটি প্রমাণ পেলে জানে শেষ করা হবে। যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তারা হলেন-

১. কালামনি চাকমা, ২. রবি সুন্দর চাকমা, ৩. পুলিন বিহারী চাকমা, ৪. রাতমনি চাকমা, ৫. জয়মনি চাকমা।

পরের দিন ১২ জানুয়ারী আজনটিলা সেনা জোয়ানরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শুভেন্দু বিকাশ ত্রিপুরা ও পূর্ণজয় ত্রিপুরার বাড়ীতে তল্লাশি চালায় ও নানা হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে পাড়ার অন্যান্য বাড়ীতেও তল্লাসী চালায়।

প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা

দ্বিতীয় পাতার পর

উল্টো। শরণার্থীরা ফিরে আসার পরপরই যাদের বিরুদ্ধে মামলা, হুলিয়া আছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। প্রত্যাগত শরণার্থী কালাধন চাকমা (খাগড়াছড়ি সদর থানা) কে গ্রেফতার করা হয়। তাকে বিনা বিচারে এক বছর এক দিন কারাগারে থাকতে হয়েছে। অনেক প্রত্যাগত শরণার্থীদের পরিণতি কালাধনের মত হয়েছে। তাছাড়া অনুপ্রবেশকারী বাঙালীদের দ্বারা নানান হয়রানি মুলক মিথ্যা মামলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

প্রত্যাগত শরণার্থী চাকুরী জীবীদের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি ছিল, যারা শরণার্থী হবার পূর্বে সরকারী চাকুরীতে ছিল তারা স্ব স্ব পদে পূনঃ নিয়োগ পাবেন। আর অন্যান্যদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী দেয়া হবে। বেকাররা তো চাকুরী পায়নি, অপর পক্ষে চাকুরী জীবীরাও তাদের চাকুরী ফিরে পায়নি। গুটিকয়েক শরণার্থী যারা চাকুরী ফিরে পেয়েছে তাদেরকে বয়োজ্যোষ্ঠতা দেয়া হয়নি। ফলে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে নানান ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। যারা চাকুরী ফেরত পায়নি তারা হলেন-

১. সমীর কান্তি দেওয়ান- প্রজেক্ট সুপারভাইজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ২. উপেন্দ্র লাল চাকমা, টাইপিষ্ট, ৩. প্রতাপ সিং চাকমা- সোনালী ব্যাংক পানছড়ি শাখা, ৪. আনন্দ শোভা চাকমা- প্রাইমারী স্কুল শিক্ষিকা, ৫. প্রমবিন্দু চাকমা - বি.এ.ডি.সি।

সরকার ৫০,০০০ শরণার্থীর মধ্যে ৫,১৮৬ জন কে ১৬ দফা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনলেও সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। ১৬ দফা বাস্তবায়নের কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাও সরকার প্রশাসনের তরফ থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সরকার যেখানে মাত্র ৫,১৮৬ জনকে ঠিকমত পূনর্বাসন করতে পারছে না, প্রতিশ্রুতি অনুসারে সরকার জায়গা জমি সহ প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দিতে পারছে না, সে অবস্থায় কি ভাবে ভারতে আশ্রিত আরো বাকী ৪৫,০০০ এর অধিক শরণার্থীকে ফিরিয়ে এন পুনর্বাসন করতে পারবে?

প্রত্যাগত শরণার্থীদের উপর অনুপ্রবেশকারীদের হামলা সেনা ক্যাম্পে নির্যাতন

জ্বালিয়া পাড়ার প্রত্যাগত শরণার্থী বীর কুমার চাক্‌মা (২৫) কে উত্ত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে তার ফলের বাগানে অনুপ্রবেশকারী হোসেন লিডারের স্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর গরু বেধে রাখে। এতে বীর কুমার চাক্‌মা প্রতিবাদ জানালে হোসেন লিডার ক্ষেপে যায়। বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ করার অশুভ উদ্দেশ্যে হোসেন লিডার অনুপ্রবেশকরীদের দলবল নিয়ে বীর কুমারের বাড়ীতে হামলা চালায়। ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। বল্লম, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ঘরের বেড়া কেটে ফেলে।

বীর কুমার কোনমতে তার স্ত্রী মিত্যু পুদি (২১) ও তিন বছরের কন্যাকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারলেও নিজে আটকা পড়ে যায়। তাকে অনুপ্রবেশকারীরা টেনে হেঁচড়ে উঠানে নিয়ে আসে এবং ইচ্ছেমত লাঠি সোঠা দিয়ে গুরুতর ভাবে আঘাত করে। তাকে হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য পাশের বাড়ী থেকে তার নিজ ছোট ভাই মিন্টু(১৬), পিতা ভারত বিজয় চাক্‌মা (৫০) ও নিকট আত্মীয়া মিসেস রংমালা চাক্‌মা (৫১) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে হামলাকারী অনুপ্রবেশকারীরা তাদেরকেও মারধর করে। বীর কুমার ও মিন্টুকে মারাত্মক ভাবে জখম করে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাড়ীর উঠানে ফেলে দেয়। নগদ কিছু টাকা সহ জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। বীর কুমার ও মিন্টুর জ্ঞান ফিরে এলে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিকটস্থ কালাপানি আর্মি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয় ও প্রাণ ভিক্ষা চায়। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ তাদেরকে রাত ন'টায় গুইমারা ব্রিগেডে চালান দেয়। সেখানে তাদের দুই ভাইকে সেনাসদস্যরা মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর করে। তাদের বাড়ীতে শান্তিবাহিনী আছে কিনা, তারা নিজেরা শান্তিবাহিনী কিনা, অস্ত্র কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, হোসেন লিডারের গরু বাধায় কেন বাধা দিয়েছ ইত্যাদি নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে। গুইমারা ব্রিগেডে তাদেরকে দু'দিন আটক রেখে নির্যাতন করা হয়। এলাকাবাসী তাদের মুক্তির দাবীতে মিছিল করার প্রস্তুতি নিলে, খবরটি ব্রিগেডে পৌঁছে এবং তাদেরকে ২ জানুয়ারী ছেড়ে দেয়া হয়। ছেড়ে দেয়ার সময় নির্যাতনের ফলে বীর কুমারের রক্তাক্ত শার্টটি সেনারা খুলে রাখে। সেটি আর ফেরত দেয়নি। ছেড়ে দেয়ার দিন হতে ১৫দিনের মধ্যে গুইমারা ব্রিগেডে তিন জন শান্তিবাহিনী সদস্যকে হাজির করে দেয়ার নিদের্শ দেয়। অন্যথায় তাদেরকে জানে শেষ করা হবে বলে ব্রিগেড কর্তৃপক্ষ হুশিয়ার করে দেয়।

অনুপ্রবেশকারী হোসেন লিডারের হামলায় সর্বশান্ত বীর কুমারের পরিবার এখন পথে বসেছে।

এখানে উল্লেখ্য, বীরকুমার ও তার পিতা ভারত বিজয় আরো অনেকের মত ১৯৮৬ সালে সেনা ও অনুপ্রবেশকারীদের হামলায় বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁরা ১৯৯৪ সালে সরকারের সাথে ১৬ দফা চুক্তির ভিত্তিতে ৩ আগষ্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। সে সময় দু'পর্যায়ে ১০২৭ পরিবার স্বদেশে ফিরে এসেছিল। বীর কুমারের মত আরো অনেকেই স্বদেশে ফিরে এসেও নিজ বসত বাড়ীতে শান্তিতে থাকতে পারতেছে না। বহু সংখ্যক পরিবার সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাস্তভিটা ফেরত পায়নি। যারা অনেক কষ্টে ফিরে পেয়েছে, তারাও আশে পাশের অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত হুমকীর সম্মুখীন। অনুপ্রবেশকারীরা প্রত্যাগত শরণার্থী ছাড়াও জুম্মোদেরকে তাদের বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদের জন্য নানা ভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ীদের ফসল নষ্ট করে দেয়া, জমিতে গরু-ছাগল লেলিয়ে দেয়া, ইচ্ছেকৃত ভাবে বাগান বাগিচার ফলমূল নষ্ট করে দেয়া, এ সবের প্রতিবাদ জানালে দলবদ্ধ হয়ে দাঙ্গা বাঁধানোর চক্রান্ত করা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এসবের প্রতিকার চেয়ে নালিশ করলেও কোন ফল হয় না। ৩১ ডিসেম্বরের ঘটনার প্রতিকার চেয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কাছে সুবিচারের আশায় বীর কুমারের স্ত্রী মিত্যু পদি চাক্‌মা ৪ জানুয়ারী আবেদন জানায়। এতেও কোন কাজ হয়নি বলে জানা গেছে।

সেনা নির্যাতন ও সিভিল প্রশাসনের সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের স্টীমরোলারে এভাবে নিরীহ জুম্মরা পিষ্ট হচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বর অনুপ্রবেশকারীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে সেনা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ে উল্টো তাদেরকে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। জেলা প্রাশাসকের কাছে বিচার চেয়েও কিছু হয়নি। ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন- জুম্মোদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করার জন্যই সেনা ও বেসামরিক প্রশাসন সূক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লংঘিত হলে তা স্বাধিকার প্রতিনিধি অথবা তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে জানান।

গণপরিষদ নেতা অজয় বিকাশ খীসার জীবনাবসান

অজয় বিকাশ খীসা

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ৯ই ফেব্রুয়ারী '৯৭ পাহাড়ী গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবক জননেতা অজয় বিকাশ খীসার জীবনাবসান ঘটে।

পাহাড়ী গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলী শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সববেদনা জানিয়ে এক শোক বার্তা প্রেরণ করে। এতে বলা হয় "তার অকাল মৃত্যুতে গণ পরিষদ হারিয়েছে একজন নিবেদিত প্রাণ দেশ প্রেমিক সহযোদ্ধা ও প্রতিভাবান সংগঠককে। কাজলং এলাকাবাসী হারিয়েছে একজন সমাজসেবক ও অকৃত্রিম বন্ধুকে।

"গণমানুষের সংগঠন হিসাবে পাহাড়ী গণ পরিষদকে সুসংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে অজয় খীসার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে গণ পরিষদ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে"।

"স্বাধিকার" চুরি

এই দেশে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই-এর ঘটনা অহরহ। প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই এসব খবর চোখে পড়ে। আর এইসব অপরাধমূলক কাজের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী। যেমন- সোনা, রূপা, টাকা পয়সা। বইপত্র চুরির কথাও আমরা জানি। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বই ও ম্যাগাজিনই লাইব্রেরী থেকে চুরি হয় অথবা বে-ফেরৎ হয়ে যায়। ফাইল চুরির খবরও অবিদিত নয়। কিন্তু কিছুদিন আগে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় এক গৃহস্থের বাড়ী থেকে স্বাধিকার চুরি (নাকি ডাকাতি) হয়। আর এই কম্মটি ঘটিয়েছে স্বয়ং সেনাবাহিনী।

ঘটনাটি ঘটে গত ১৩ জানুয়ারী ১৯৯৭। স্থানীয় ক্যাম্পের কিছু সেনা জোয়ান ঐদিন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মাটিরাঙ্গা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক হরি কিশোর চাকমার বাড়ীতে হানা দেয়। তখন বাড়ীতে কোন লোকজন ছিল না। সেনারা অনুমতি ছাড়া বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং তল্লাশী চালায়। তারা পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ মুখপাত্র "স্বাধিকারের" বেশ কিছু কপি নিয়ে যায়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক এই স্বাধিকার চুরির ঘটনা স্বাধিকারের জনপ্রিয়তারই স্বীকৃতি। স্বাধিকার স্বাধিকারহারা মুক্তিকামী জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। স্বাধিকার অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে। ষড়যন্ত্র, ভন্ডামী ও সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোশ খুলে দেয়। এজন্য স্বাধিকার জনগণের কাছে জনপ্রিয় হলেও সেনাবাহিনী ও সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে এক আতঙ্ক।

আন্তর্জাতিক

ব্যাংককে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ব্যাংকক থেকে স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ আগামী ২৩ থেকে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জুম্ম প্রতিনিধি, দুই বাংলার প্রখ্যাত শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মী, UNHCR ও UNICEF এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবেন। এ ছাড়া বৃটিশ মানবাধিকার সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির প্রধান ও লর্ড এভিবুরি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ডগলাস সান্ডার্সও সম্মেলনে যোগ দেবার কথা আছে।

সম্মেলনে স্বায়ত্বশাসন প্রশ্ন, ভূমি, শরণার্থী, বসতি স্থাপনকারী বাঙালী, সেনাবাহিনী ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করা হবে এবং কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কর্মসূচীর শেষ দিনে সুপারিশমালা ও Action plan পাশ করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্ত্বাসমূহের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে তিন বার পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে আমষ্টারডামে, ১৯৮৯ সালে স্টকহোমে এবং ১৯৯১ সালে জার্মানীর হামবুর্গ শহরে। এই সম্মেলন সমূহের ফলস্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। তাছাড়া উক্ত সম্মেলন সমূহের ফলে (১) আমস্টারডামে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন (Chittagong Hill tracts Commission), Organising Committee of the Chittagong Hill Tracts Compaign এবং বিভিন্ন দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে এ ধরনের বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। (২) CHT কমিশনের নেতৃত্বে একটি তথ্য সন্ধানী দল ভারতও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা সফর করে।

(৩) Life is not ours : Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts শিরোনামে ১৯৯১ সালে CHT কমিশনের মূল রিপোর্ট এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে এই রিপোর্টের update প্রকাশিত হয়। (৪) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সরকার বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। (৫) সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। এবং (৬) ১৯৯৩ সালে জাপানে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়। ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনটি এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সমাধানের লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা চলছে। এই উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সংলাপ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে সম্মেলনের আয়োজকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রচার ও প্রকাশনা দপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত স্বাধিকার সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।